



ফলো করুন

শেয়ার করুন



ছবি



ভিডিও



ছবি

[জেলা](#)

ফিরে দেখা

৪০৮ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত, ১২৭ জনের মৃত্যু—সেদিন যেন কেয়ামত নেমেছিল

প্রণব বল চট্টগ্রাম



২০০৭ সালের ১১ জুন পানিতে তলিয়ে যাওয়া চট্টগ্রামের প্রবর্তক মোড় ফাইল ছবি।

তখন বর্ষাকাল আসি আসি করছে। জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরুতে মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশে ঢুকেছে। কয়েক দিন ধরে থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টিটা লাগামহীন হয়ে পড়ে ১০ জুন রাত থেকে। এক রাতের বৃষ্টিতে পুরো শহর হয়ে পড়ে জল থইথই। স্থানে স্থানে পাহাড় ধসে পড়ে। চারদিকে পানি আর পানি। আর তাতে ভেসে যায় মানুষ। পাহাড়ের নিচে

বৃষ্টি, জলাবদ্ধতা, পাহাড়ধস আর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ওই দিন চট্টগ্রামে মারা গিয়েছিলেন ১২৭ জন। পানিতে তলিয়ে যায় নগরের হাজার হাজার বাড়িঘর। মাথা পর্যন্ত পানি ছিল শহরের সড়কজুড়ে। দুই একটি উঁচু স্থান ছাড়া সবখানে ছিল পানি আর পানি। তবে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে পাহাড়ধসে—সেনানিবাস এলাকার কাইচ্ছাঘোনা, জাহাঙ্গীর লেন ও লেবুবাগান এলাকায়। এ ছাড়া শহরের কুসুমবাগ, খুলশীসহ বিভিন্ন এলাকায়ও পাহাড়ের নিচে চাপা পড়ে মানুষ।



পাহাড়ধসে চাপা পড়ে নিহত এক শিশুর লাশ উদ্ধার করে আনছে ফায়ার সার্ভিস ফাইল ছবি

পাহাড়ের নিচ থেকে উদ্ধার তৎপরতা চালাতে গলদঘর্ম হয়ে যায় সেনাবাহিনী, ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশের। এক সপ্তাহ ধরে চলে উদ্ধার অভিযান। দুই দিন পানিবন্দী ছিল অনেক মানুষ। তখন দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসন। এ ঘটনায় চট্টগ্রাম ছুটে আসেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিলের ভয়াল ঘূর্ণিঝড়ের পর এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ চট্টগ্রাম আর দেখেনি। এর এক দশক পর ২০১৭ সালের ১৩ জুন আবার একটা ভয়াবহ পাহাড়ধসের ঘটনা ঘটে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে। সেবার ১৬৮ জন মারা যান।

বিপর্যয়ের নেপথ্যের কারণ



ফলো করুন

শেয়ার করুন

জোয়ার একসঙ্গে হওয়ার কারণে বিপর্যয় নেমে আসে।

প্রাকৃতিক কারণের বাইরে কিছু মনুষ্যসৃষ্ট কারণ চিহ্নিত করেছিলেন বিশেষজ্ঞরা। এর মধ্যে পাহাড় কেটে বসতি স্থাপন, নালা-নর্দমা ভরাট, খাল দখল, পর্যাপ্ত পানিনিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদি। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও তা আমলে নেয়নি তখনকার প্রশাসন। এ জন্য আগাম কোনো সাবধানতা অবলম্বন করা হয়নি। যার জন্য এত প্রাণহানি ঘটে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

একই দিন শহরের বাইরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়ও পাহাড়ধসের ঘটনায় প্রাণহানি ঘটে। এখানে একই পরিবারের মা, তিন ছেলে ও এক মেয়ে মারা গিয়েছিল। মেয়ে জান্নাতুন নিছা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন।

এ রকম আরও অনেক পরিবার একাধিক সদস্যকে হারিয়েছে ভয়াবহ এই দুর্যোগে। বিশেষ করে লেবুবাগান, কাইচ্ছাঘোনায় বলতে গেলে মানবিক বিপর্যয় নেমে আসে। এখানে বসবাস করতেন নিম্ন ও মধ্য আয়ের লোকজন। তারা ঘরবাড়ির সঙ্গে হারিয়েছেন আপনজনদের। গণকবরে ঠাঁই হয়েছিল মৃত মানুষদের। আর প্রাণে বেঁচে যাওয়া মানুষজনের দিন কেটেছে রাত কেটেছে আশ্রয়কেন্দ্রে। জমে থাকা পানি নেমে যাওয়ার পর নানা রোগব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়ে শহরে।

তদন্ত ও পাহাড় রক্ষা কমিটি গঠন

পাহাড়ধসের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এম এ এন ছিদ্দিককে প্রধান করে হয় সদস্যের কমিটি ২৩ জুন প্রতিবেদনও দিয়েছিল। প্রতিবেদনে তারা ঘটনার কারণ ও ভবিষ্যতে এমন বিপর্যয় রোধে ৩৬টি সুপারিশ দিয়েছিল। ওই প্রতিবেদনের আলোকে পাহাড় ব্যবস্থাপনার জন্য একটা কমিটি গঠন করা হয়।

[ফলো করুন](#) [শেয়ার করুন](#)


চাপাপড়া ঘরবাড়ির মাটি সরানোর কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ফাইল ছবি

এই কমিটির নাম দেওয়া হয় শক্তিশালী পাহাড় ব্যবস্থাপনা কমিটি। বিভাগীয় কমিশনারকে এই কমিটির আহ্বায়ক করা হয়। পরে কমিটির নাম থেকে শক্তিশালী শব্দটি বাদ দেওয়া হয়।

এই কমিটির দায়িত্ব মূলত পাহাড় ব্যবস্থাপনার। পাহাড়ে অবৈধ বসতি স্থাপন বন্ধ করা, পাহাড় কাটা বন্ধ করাসহ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করবে তারা। এ ছাড়া ১১ জানুয়ারির পাহাড়ধসের ঘটনায় দেওয়া তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে।

তবু বসতি, পাহাড়ধস প্রতিবছর

ফলো করুন শেয়ার করুন



পানিতে ডুবে যাওয়া জনপদ ফাইল ছবি।

এখনো পাহাড়ে বসতি রোধ করা যায়নি। বরং তা বেড়েই চলেছে। তদন্ত কমিটির দেওয়া ৩৬টি সুপারিশের সিংহভাগ বাস্তবায়ন হয়নি। চট্টগ্রাম নগরের বিভিন্ন পাহাড়ে এখন অবৈধ বসতির সংখ্যা ৬ হাজার ১৭৫ পরিবার। মোট ঝুঁকিপূর্ণ বসতিসম্পন্ন পাহাড় রয়েছে ২৬টি। অথচ ২০১৪ সালে ১১টি পাহাড়ে ৬৬৬টি পরিবার বসবাস করত। সবচেয়ে বেশি লোকের বসবাস নগরের রেলওয়ের পাহাড়গুলোতে। প্রতিবছর উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু তা বাস্তবায়ন আলোর মুখ দেখে না।

জানতে চাইলে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান প্রথম আলোকে বলেন, জেলা প্রশাসন প্রতি বর্ষায় অস্থায়ীভাবে উচ্ছেদ করে নিরাপদে সরিয়ে নেয় পাহাড়ের বাসিন্দাদের। তারা ঝুঁকির বিষয়টি কানে তোলে না। আবার সেখানে গিয়ে বসতি গড়ে তোলে। বেশির ভাগ পাহাড় রেলওয়ের। তাদের বারবার বলা হয়েছে নিজেদের পাহাড় সীমানাদেয়াল দিয়ে সুরক্ষিত করার জন্য। কিন্তু তা এখনো করা হয়নি।

[ফলো করুন](#) [শেয়ার করুন](#)


পানিতে ভেসে যাওয়া একটি গাড়ি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে ফাইল ছবি

২০০৭ সালে ভয়াবহ পাহাড়ধসের পর চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ একটা প্রকৌশলগত প্রতিরোধ কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। তারা ১২টি ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড় পরিদর্শন করে এগুলো সংরক্ষণ করার পদ্ধতি এবং বসতি রোধে নানা পরামর্শ দিয়েছিল। সেগুলোর বাস্তবায়নও হয়নি। ফলে পাহাড়ধসে মৃত্যুর ঘটনাও থামছে না।

২০০৭ সালের আগেও চট্টগ্রামে পাহাড়ধসে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল। ২০০৪ সালে লালখান বাজার এলাকায় মারা গিয়েছিল চারজন। এর আগে ২০০০ সালে বাঘগোনা এলাকায় তিন শিশু মারা যায়। তবে ১১ জুনের পাহাড়ধসের ঘটনার পর প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। কিন্তু এখনো প্রতি বছর কমবেশি পাহাড়ধসের ঘটনা ঘটছেই। ২০২২ সালে আকবরশাহ ১ নম্বর ঝিলে একই পরিবারের দুজন মারা যায় পাহাড়ধসে।



প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন

 prothomalo.com